

# না মেয়েমানুষের কাহিনি

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

আরে ছিঃ ছিঃ ! কী বেআক্কেলে মেয়েরে বাবা। সকালবেলা গোটাকতক উঠতি ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে এনে বাড়ি বয়ে শাসিয়ে গেল। কালে কালে আর কত দেখব ! মেয়ে তো নয় যেন সিপাই-দারোগা। হরেন মাইতি গজগজ করতে করতে সামনের পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে দাবার ওপর বসা মাছিগুলোকে সপাসপ ঝাঁটা পেটা করছে সশব্দে। যেন কুরুক্ষেত্রে গদা হাতে মারমুখী ভীম। সামনে ভূপতিত সৈন্য। হরেন দাসের বউ পুকুরঘাটে থালা মাজতে মাজতে বাড়ির ভেতরের চড়া গলায় কথা কাটাকাটি শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু হাতজোড়া বলে আসতে পারেনি। দাবার ওপর থালা-বাসন নামিয়ে কাপড়ের আঁচলে হাত-মুখ মুছতে মুছতে জিঞ্জেস করল— হ্যাঁগো, কাদের সঙ্গে সকালবেলা অমন হট্ট-চট্টো করছিলে ? ঝাঁটা দিয়ে সপাতে আর একজন কৌরব সেনা মেরে হরেন মাইতি ব্যাজার মুখে বলে— আর বলো না, দেশ-গাঁ এখন শহরের বাড়া, একেতো পাটিতে পাটিতে নিত্যদিন খেউড়-খিস্তি। আর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ওই ক্লাবের ছেলেগুলো জুটে আজ এই মচ্ছব, কাল ওই কেতন। সঙ্গে জুটেছে বিষ্ণু সামন্তের ওই বাবরি চুলো দামড়া মেয়েটা।

—ওঃ পিয়ালী এসেছিল বুঝি ? আহা, বড় গুণের মেয়ে, যেমনি পড়াশুনায় তেমনি খেলাধুলায়, একেবারে ডাকাবুকো। চৌকস মেয়ে।

—হ্যাঁ, তবে আর কি। ওই আনন্দে ধেই ধেই করে নাচো ! মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতো থাকলে ভালো দেখায়। কোনো শিষ্টাচার বোধ নেই, শালীনতা নেই। কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে কোমরে গামছা সঁটে মদদের সঙ্গে হট্টো পাটি করে ফুটবল খেলেছে।

—ফুটবলও খেলে বুঝি ?

—তবে আর বলছি কি ?

—তা হ্যাঁগো, তখন থেকে তো বকর বকর করছ, পিয়ালীরা কেন এসেছিল সে তো বললে না!

—তেনাদের সখ হয়েছে এ বছর থেকে গ্রামে দুর্গাপূজো করবেন। আজ মিটিং। তাই খবর দিতে এলেন ও চাঁদার একটা আগাম বহর জানিয়ে গেলেন।

—তুমি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে টকঝক করেছ?

—করব না, কী দরকার এসব হাঙ্গামা জোর করে ডাকবার, বেশ তো আছি।

—তা হাঙ্গামাটা কিসের শুনি? দুর্গাপূজোর সময় চারদিকে যখন আনন্দের হাট বসে তখন আমাদের এই চার-পাঁচটা গেরাম একেবারে আঁধারে ডুবে থাকে। আর কালীপূজোর সময় সব গেরামে মায় পাড়ায় পাড়ায় এটা করে কালীঠাকুর তুলে সাঁইগুটি মিলে মদ গেলে। আহা, মা-দুগ্ধা আসবেন শুনে মনের ভেতরটা যেন কেমন আনন্দে নেচে উঠছে।

—তা তো হবেই। আমার বলে চাঁদার খবর শুনে গায়ে জ্বর। আর, ওনার আনন্দে গা উলসে উঠছে। বলি চাঁদার বহরটা শুনেছ?

—কত? পাঁচশ টাকা। তা হবে নে, দুর্গাপূজো বলে কথা। এতো আর কালীপূজো নয় যে একদিনেই শেষ। অত টাকা টাকা করোনি তো, হিসেবটা একটু অন্যভাবে দেখ না কেনে! কেল্লাব থেকে ওরা যে ফ্রি-কোচিংটা দেয় তাতে তো আমাদের ছোট ছেলেটা পড়ে। অন্য মাস্টারের কাছে হলে নিদেনপক্ষে এই পাড়াগাঁয়েও মাসে একশো টাকা দিতি হতো। তাহলে?— আরে দুর্গাপূজো না এলেও তো ওরা পড়াত।

—ও নিজের বেলা আঁটিসাঁটি পরের বেলা দাঁতকপাটি। দ্যাখো, তুমি যদি মিটিনে না যাও আমি যাব। আর আমাদের পিয়ালী যখন আছে তখন নিশ্চয় খুব ভালো করেই পূজো হবে।

—তবে আর কি খোল-কত্তাল নিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়।

—পড়বই তো, মেয়েটার বাবা যেমন মানুষের দুঃক্ষে বুক দিয়ে বাঁইপে পড়ত মেয়েও তেমনি। খেপনে খেপনে বাপের ধারা পাচ্ছে, গুণী বাপের গুণী মেয়ে।

—হ্যাঁ, গুণী না ছাই। নকশাল পার্টি করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণটা দিলে, গ্রামেরও এস্তার বদনাম হল।

—দ্যাখো, নোকশাল-ফোকশাল জানি না, মানুষটা গরিব মানুষের জন্য দুঃক্ল করতুক ব্যাস। আর আমি মুখ্যসুক্ল মানুষ অত শত বুঝি না বাপু, গেরামের ছেলে-মেয়েরা আনন্দ করে মায়ের পূজো করবে, চারদিন গেরামটা আলো



বালমল করবে, বাচ্চাকাচ্চারা একটু হৈ-হুল্লোড় করবে, এতে বাপু আমার খুব সায় আচে বলে হস্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। হরেনবাবু এতক্ষণ ধরে পুজো বন্ধ করার যে সব পাঁচ-পয়জার আঁটছিলেন গৃহিণীর কড়া সওয়াল-জবাবে তার আঁটো গেরোগুলো এলোমেলো হয় গেল।

খালেরদাঁড়ি গ্রামটা আকারে খুব বড় না হলেও একেবারে নেহাত ছোটও নয়। একশ দশ— বারো ঘর মানুষের বাস। মাহিষ্য প্রধান গ্রাম। তবে কয়েকঘর পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, ঘর তিন-চার যজ্ঞমানে ব্রাহ্মণ ও এক চক কোরঙ্গাদের বাস। মাহিষ্য ও পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়দের প্রধান পেশা চাষ-আবাদ। তবে ইদানীং কিছু কিছু লেখাপড়ার চল হয়েছে। দু-একজন ইতিউতি চাকরিবাকরিও করে। তারা অধিকাংশ হয় হপ্তাবাবু আর যারা একটু ভালো কিছু করে তারা মাসবাবু, নয়তো দেশছাড়া। বুড়ো বেদরা বলে— শহরে ঘোড়ার গু মেড়িয়েচে, সাহেব-ম্যাম দেখেচে আর কি দেশের কথা মনে থাকে!

যারা বাইরে থাকে তাদের যুক্তিও ফেলনা নয়। তিন মাইল দূরে বাস রাস্তা, যেতে আসতে জান কাবার। বর্ষাকালে তো আরো বেহাল অবস্থা। দু-দল দু দলের যুক্তি আঁকড়ে চোরা গোপ্তা তীর ছোঁড়াছুড়ি করে। মাঝে মাঝে আঘাত লাগে বটে তবে সে আঘাত তেমন গুরুতর নয়। সময় বিশেষে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে গিয়ে আবার সম্পর্ক বিশেষে হাসিঠাট্টা খাই-খাওয়া-দাওয়া চলে পালপার্বণে। এখনও পুরানো রেশ কিছুটা হলেও আছে— আবাদ করে, বিবাদ করে— সুবাদ করে তারা।

পাঁচ-ছ ঘর ব্রাহ্মণদের মধ্যে দু-জনার অবস্থা মন্দের ভালো। বাকিদের দিন আনি দিন খাই বললেও কম বলা হয়। দিন খেতে হয় জানে কিন্তু কী করে যে দিনের খাবার জোগাড় করতে হয় তার সুলুক সন্ধান এখনও তারা হৃদিশ করতে পারেনি। এরা সবাই যাজুনে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ছেলে হাল চষতে, হাট করতে মানে লাগে আবার লেখাপড়া শিখে নিজেদের যে যোগ্য করতে হবে সে বোধ তাদের আজও হয়নি। তবে জাতের অহমিকা খুব। কথায় কথায় জাত তোলে। গ্রাম সুবাদে অন্যদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখে বটে তবে সেটা একেবারেই ওপর ওপর। সামাজিক কাজ-কর্মে একসাথে খাই-দাই হয় তবে ব্রাহ্মণরা নিজেদের রান্না নিজেরাই করে। এরা শুদ্রের শ্রম-দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি আবার সঙ্গদোষে ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হতে পারেনি। ওদের মধ্যে দু-ঘরের অবস্থা ভালো। বড় ভট্টাচার্য আর ছোট ভট্টাচার্য। এমনিতে দু-বাড়িতে খুব



রেষারেষি। তবে দুঃখের চর্বণে দু-জনে মিলে যায়। বড় ভট্টাচার্য মুখে কষ্টের বলিরেখা ঐকে বলে— বুঝলি দীনু, ধংস আসন্ন, কলির শেষ পর্ব চলছে।

এ গ্রামে আর আছে এক চক কোরঙ্গা। তারা জাত-ধর্মে-ক্রিয়াকর্মে হিন্দু বটে আবার হিন্দুও নয়। তাদের আচার ব্যবহার অনেকটা হিন্দুদের সঙ্গে মেলে তবে নিজেদের কিছু আচার-আচরণ আছে যা একান্ত তাদের নিজস্ব। বরং যাযাবরদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এদের অনেকটা মেলে। এরা সঞ্চয় একদম পছন্দ করে না। একটাই কিছুদিন থাকলে তাদের সুখের অসুখ করে। পাল-পার্বণে মেয়ে-মদ মদ খেয়ে বেহদ হয়ে নাচে। লাজ-শরমের বালাই নেই। তাদের নিজেদের গোষ্ঠীপতি আছে। তার নির্দেশ ওদের কাছে আইনের বাড়া। মেয়েদের ইজ্জতের ব্যাপারে ওরা খুব হুঁশিয়ার। কোনো বেচাল দেখলেই কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে। ওরা স্বভাবে একটু অপরাধপ্রবণ। তবে ভীষণ ছল্লুড়ে। আমোদ আহ্লাদের গন্ধ পেলে আর গায়ে জ্ঞান থাকে না। ওদের জাত ব্যবসা গরুর দালালি— গরু-ছাগল-মোষ-ভেড়া নির্বীজ করণ। তবে এখন ট্রাক্টরে চাষ হওয়ায় গরু বেচাকেনা অনেক কম। ফলে রুটি-রুজির তাগিদে ওরা এখন নানা ব্যবসায় হাত লাগিয়েছে। মায় ভিক্ষে। তবে অভাবকে ওরা খুব পাত্তা দেয় না। সামান্য কিছু খাবারের সংস্থান হলেই ওরা আর কাজ করবে না। গোটা ভাদ্র মাসটা ওদের অনেকে এর ওর গাছের তাল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।

কষ্ট কষ্ট এগার মাস কষ্ট

তাল পাকলে আবার কিসের কষ্ট।

গ্রামটার একটা ছোট ইতিহাস আছে। একসময় টালিগঞ্জের খাল এ গ্রামের শেষপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন কলকাতা থেকে সরাসরি নৌকা চলাচল করত। রাস্তাঘাট এত গড়ে ওঠেনি। কলকাতা থেকে লোকে খালপথ ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসত। এ অঞ্চলে তখন খুব পাটের চাষ। মাটি খুব উর্বর। চेतলার একদল পাটের ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে এসে জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে যেতে এখানে কিছু অস্থায়ী ঠেক তৈরি করে। তারপর ধীরে ধীরে পাকাপাকিভাবে বসবাস। খালের এক পারে মাইতিরা অন্য পারে সামন্তরা। তাদের দেখাদেখি অন্যান্যরা ইতিউতি ঘর বাঁধে। মাইতি ও সামন্তদের মধ্যে যে ব্যবসায়িক রেষারেষি তা বংশ-পরম্পরায় চারিত। এদের কলী বিশ হাত হলে ওদের

শিবের পেটে আস্ত একটা জালা ঢুকে যাবে। মাইতিদের আর্থিক অবস্থা ভালো তবে তারা স্বভাব কুচুটে ও জাত কিপ্টে। সামন্তদের সঙ্গতি পড়তির, দিকে তবে দান-খয়রাতের হাত দরাজ।

গ্রামের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে আগাছায়-লতাগুল্মে ভরা একটি ভাঙা বাড়ি। খাস জমি। বাড়ির চারপাশে নানান জাতের গাছগাছালি হারাহারি করে লম্বা হয়ে উপরে উঠেছে সূর্যের আলোর দখল নেবে বলে। অনেকটা ভূতুড়ে ভূতুড়ে চেহারা। মাঝখানে নোনাধরা মাটির দেওয়াল ঘেরা একটা ঘর। পূব ও দক্ষিণ দিকে চওড়া বারান্দা। এর বাসিন্দা গোটা কয় ঘুঘু-পায়রা— ছাতারে-কাঠবিড়ালী আর শ্যামা পাগলী। শ্যামা পাগলী মন হলে ভিক্ষায় বের হয় আর না হলে তার না-মানুষ প্রতিবেশী অনুগ্রহ প্রার্থীদেরকে শাসন-সোহাগ করে দিন কাটায়। ঘুঘুগুলোকে স্বর খাদে এনে বলে— আয়, আয় দুটো খেয়ে যা— পায়রা আর কাঠবিড়ালীদের ধমক— খালি খিটিরমিটির, খিটিরমিটির। অত খাই খাই বাই কেন? ছাতারগুলোর দিকে চোখ পাকালে পাকিয়ে বলে— কী সব সময় অমন ছাঃ ছাঃ করিস? আগে নিজের ছাটা দ্যাখ। আর এর মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে—

দেবের বেলা নিলে খেলা।

নরের বেলা দোষ নিখিলা।

দিনের বেলা শ্যামা পাগলী যতক্ষণ ঘরে থাকে তার না-মানুষ প্রতিবেশীরা তাকে নিঃসঙ্গ রাখে না। বড়রা বলে শ্যামা পাগলীর বয়স ষাটেরও বেশি। কোমরটা অনেকটা বেঁকে গেছে। একটা লাঠির সাহায্য নেয় বটে তবে শরীরে এখনও বেশ জোর। দেখলে বোঝা যায় একসময় সে বেশ সুন্দরীই ছিল। শ্যামা পাগলী বর্তমান বড় ভটচার্যের সম্পর্কে পিসিমা। শ্যামার একটা ঘটনাবহুল অতীত আছে।

শ্যামা ভটচার্য বাড়ির মেয়ে। কিন্তু ভটচার্য বাড়ির আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শ্যামার কিছুতেই মিল খায় না। না চালে, না চলনে। অন্যান্য মেয়েরা যখন পুতুলের বিয়ে দিয়ে, খেলামারি রান্না করে, সকাল-সন্ধ্যা তুলসীতলায় ঝাঁট ও সন্ধারতি দিয়ে গুরুজনের সুনাম কুড়ায়, শ্যামা তখন একাদোকা খেলে। মাঠে মাঠে ঘাসফড়িং ধরে, পুকুরের জলে খোলা দিয়ে ব্যাঙ খেলা করে। মা-কাকিরা



অন্যের উদাহরণ দিয়ে শ্যামাকে খোঁটা দেয়, শ্যামা ভ্রক্ষেপহীন ভাবে বলে— সঙ্কলেকে সমান হতে হবে তার বা মানে কি! সে সকাল-সন্ধ্যে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। এমনকি রাতে শোয়ার আগেও আয়নায় মুখ দেখে। ওর মা দেখতে পেলে আয়নাটা কেড়ে নিয়ে বলে— হায় হায়, মেয়েমানুষ রাতে আয়নায় মুখ দেখে, লোকে দেখলে কি বলবে? ও ফ্যাল ফ্যাল করে মার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে— রাতে আয়নায় মুখ দেখলে কী হয় মা? মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে— অত বড়ো ধিকি মেয়ে এখনও জানে না রাতে মেয়েমানুষ আয়নায় মুখ দেখলে কী হয়!

তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দোয় পড়ার মুখে সে হট বলতে হট করে অনেকটা বেড়ে গেল। দেহেও তেমন পরিবর্তন এলো। ধীরে ধীরে মনেও নানা স্বপ্ন।

সামন্তদের ছোট ছেলে বরদাপ্রসাদ এই ষোলো ছাড়িয়ে সতেরোয়। যেমনি গৌরবর্ণ চেহারা তেমনি কোঁদা শরীর। তার বহু গুণ। সে ভালো বাঁশি বাজায়। খুব ভালো বাঁশ-গজি খেলতে পারে। মাধ্যমিক পাশ। গভীর রাতে বরদাপ্রসাদ যখন করুণ সুরে বাঁশি বাজায় তখন কেন জানি না শ্যামার ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে একটা অসম্ভব কিছু করতে ইচ্ছা হয়। লুঙ্গির ওপর গামছা মালকোঁচা মেরে ধপধপে সাদা গেঞ্জি পরে বরদাপ্রসাদ যখন পাশের মাঠে বাঁশ-গজি কোর্টের এপার থেকে দৌড়ে সকলকে কাটিয়ে শেষ মাথা দিয়ে বাঁ...শ বলে হাঁক ছাড়ে তখন শ্যামার বুকের ভেতরে আনন্দে-উত্তেজনায় ছমছম। সে পাশে দেখতে থাকা অন্য মেয়েদের ঠালা মেরে বলে— এ্যাই, তোদের গা'র ভেতর কেরম কেরম করছে না? তারা হাসির ঠেস মেরে বলে— ঢঙ দ্যাখ, বরদাপ্রসাদ ভালো খেলতেচে তা আমাদের গা চোমরাবে কেন শুনি? তোর বুঝি খুব হচ্ছে? বরদাপ্রসাদকে বিয়ে করবি? খুব মানাবে কিন্তু! এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে খিলখিল করে হাসে।

শ্যামার নিজের বোকামিতে নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়। সে মনে মনে ভাবে অমন করে সকলের সামনে তার ভালো লাগাটা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। বাড়িতে এসে সে নিজেকে খুব কষে শাসন করে। বরদাপ্রসাদ শুদ্ধুর— তারা ব্রাহ্মণ। একসময় শুদ্ধুরের ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হতো। এখন হয়তো সে দিনকাল আর নেই। তাই বলে...। না না, কাল থেকে আর গজি কোর্টের কাছেই যাবে না।

কিন্তু পরদিন বিকেল হতেই তার বুকের ভেতর পুরীর ঢেউ। তবু সে অনেকক্ষণ চেপে ছিল কিন্তু বেলা যত পড়ে আসতে লাগল তার বুকের মোচড় তত হেউ-ঢেউ। একটা সময় সে ছিলে খোলা ধনুকের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল। মাঠের ধারে যখন পৌঁছল তখনও তার বুকে টিপ টিপ শব্দ। সেদিন বরদাপ্রসাদ খেলতে গিয়ে ছুটের মাথায় পা পিছলে পড়ে হাঁটুতে খুব চোট পেল। হাঁটুতে পারছে না। সবাই ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। শ্যামার মনে হল তার হাঁটুটা যেন চিন চিন করছে। হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছে। সবাই জিজ্ঞেস করল— কিরে শ্যামা, মুখটা ওরকম মাঝে মাঝে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে কেন? পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে? কে একজন খিল খিল করে হেসে বলল— পেটে নয় বুকে!

একসাথে শ্যামার জীবনে মস্ত সুখ ও ভীষণ বিপদ এসে উপস্থিত। বরদার কথা স্মরণ হলেই তার বুকের ভেতর সুখের ডালাপালা দাপাদাপি করে। আবার পরিণতির কথা ভাবলে এক ঝাঁক দুঃখ এসে গুঁটিবসন্তের মতো তার শরীরের সমস্ত অঙ্গে দপদপ করে। সে যখন চোখ বুজে মনে মনে বরদাপ্রসাদের কথা ভাবে তখন চেনা আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি সব— সব তার কাছে সুন্দর, ভীষণ সুন্দর হয়ে যায়। সে মাঝে মাঝে ছুটে খাটের ওপর অকারণে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে নরম সুখগুলি নিয়ে পোষা বিড়াল ছানার মতো আদর করে। আবার একটু পরে নেয়ে-ঘেমে একশা। কোনো কারণে বরদাপ্রসাদ তার দিকে একটু তাকালে বুকে বিদ্যুতের শক।

মনের ভাব ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর। তার ভাবের আঁচে ইদানীং বরদাপ্রসাদ কেমন স্বপ্ন রাঙা। তার বেশবাসে আরো পারিপাট্য। সুখের তোড়ে শ্যামার বুকটা ভেঙে মুচড়ে খান খান। সে বোধহয় আর বাঁচবে না। সুখের যে এত জ্বালা আগে কখনো বোঝেনি। খেতে পারে না। শুতে-ঘুমোতে পারে না। সুখের জ্বালায় ছটফট করে। একদিন গভীর রাতে এমন উথাল-পাথাল সুখ সইতে না পেরে সে চুপিচুপি ঘরের বাইরে অন্ধকারে এসে নিজের মনে মনে বলল— না, এই সুখের ফাঁস থেকে তাকে বেরুতে হবে। নইলে সে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে। বাইরে একটা বড় নিমগাছের কাছে গিয়ে সে চিৎকার করে— বরদাপ্রসাদ— শুদুর। শুদুর!! শুদুর!!! বাজে। বাজে!! বাজে!!! তার স্বর চাপা দিয়ে ভেতর থেকে কে যেন আরো জোরে চেষ্টা করে বলল— বরদাপ্রসাদ সুন্দর। সুন্দর!! সুন্দর!!! ভালো। ভালো!! ভালো!!! হেরে গিয়ে সুখের



নেশায় টলতে টলতে ফিরে এসে ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। অনেকদিন আগে সে এক বৈষ্ণবীর কাছে গান শুনেছিল—

খাঁচার ভেতর অচিন পাখি  
কেমনে আসে যায়  
ধরতে পারলে মন বেড়ি  
দিতাম পাখির পায়।

মনে মনে ঠিক করল সে বৈষ্ণবীই হবে।

দেশ পাড়াগাঁ, গল্পটা ফিসফাস থেকে ফুটফুট শব্দ করে। শ্যামার বাবা কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি শ্যামার জন্যে একটা পাত্র জোগাড় করে আনল। শ্যামার থেকে বছর পঁচিশ বড়। জুলপির ধারে চুলে অল্প একটু একটু পাক। পাকানো চেহারা। দোজবর। আগের বউটা সেকো বিষ না কি যেন খেয়ে মরেছে। তবে অবস্থা ভালো। জোত-জমি—শাঁসালো যজমান সব নিয়ে বেশ রসকষ আছে। তার থেকে বড় কথা হল আগের আবাগীর বেটির কোনো ছেলেপুলে নেই। একেবারে ঝাড়া হাত পা। রাজরানির সংসার। খালেরদাঁড়ির ভটচার্যরা এর থেকে আর ভালো পাত্র কবে জোগাড় করতে পেরেছে। সব শুনেটুনে শ্যামা সকলের সামনে বলে বসল—সে দোজবর বিয়ে করবে না—সর্বনাশ! মেয়েছেলে আসরে বসে কথা বলছে! চারদিকে ছিঃ ছিঃ, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। শ্যামা দোজবরকে দোজবর বলেছে। গ্রামের মান ইজ্জৎ একেবারে ধুলোয়। শ্যামার বাবা ইদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। কি করলে কি হয় বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে শ্যামাকে দুম দুম করে কয়েক ঘা কসিয়ে দিল। যারা মেয়ে দেখতে এসেছিল তারা বেজায় অপমানিত হয়ে শাসিয়ে গেল—এই মেয়ের কী করে বিয়ে হয় তারা দেখে তবে ছাড়বে। কুলীনের ঘরে আবার দোজবর কি শুনি! ওই মেয়ের বাপের ভাগ্য যে এমন বর জুটেছিল। রূপ তো ওই। কথায় বলে না—

একে বেড়াল কালো  
তার গাঙ সাঁতরে এলো।

গ্রামের লোকেরা যারা এসেছিল তাদের মধ্যে দু-একজন বললে, হবে না, মেয়ে যে ডুবে ডুবে বেজাতের কলসির জল খাচ্ছে। শ্যামার মা মনে মনে খুশি।

তার একান্ত ইচ্ছে নয় ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হোক। কিন্তু নাচার হয়ে মেনে নিচ্ছিল। এইসব ইটপাটকিলের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে মেয়ের হাত ধরে হন হন করে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকে খিল দিল। মা-মেয়ে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে হু হু কান্না।

কদিন শ্যামা গুম মেরে চুপচাপ। তারপর পানাপুকুরে ঢিল পড়লে যেমন কিছুক্ষণ ফাঁকা হয়ে আবার বুঁজে যায় শ্যামার গ্রামের গরম বাতাস অমনি করে থিতিয়ে গেল।

সেদিন চড়কের মেলা। গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ঘোষেদের ওখানে খুব বড় চড়কের মেলা। ঘোড়াছুট, পুতুলনাচ, নাগরদোলা আরও সব কত কি! গ্রামের সব ছেলেমেয়ে ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে। শ্যামাও ক'জন বন্ধু জুটিয়ে চড়ক দেখতে গেল। তার মা প্রথমদিকে যেতে দিতে রাজি হয়নি। তারপর ভাবলে— আর ক'দিন পরে তো পরের ঘরে চলেই যাবে, তখন কি আর এমন করে সখ-আহ্লাদ মেটাতে পারবে। বন্ধুরা যখন যাচ্ছে তখন আর ভয়টা কি।

তিন বাজি ঘোড়াছুট শেষ। শ্যামারা নাগরদোলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে— এমন সময় একদল মিশকালো মেঘ হঠাৎ সোঁ-সোঁ শব্দে বুনো ঝাঁড়ের মতো তেড়ে এল। কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটে নাগরদোলার মাস্তুলে চড় চড় শব্দ। অস্থায়ী দোকানপাটের বাঁশ-খুঁটি মড়মড় করে মুখ খুবড়ে পড়ছে। গুলোনো ঝড়ে শুকনো বাঁশপাতা আর ধুলো মিশেল হয়ে চোখে-মুখে। মেলায় থাকলে যে কোনো সময় চাপা পড়ে মরে যাবে। যে যেদিকে পারছে সামনের লোকের পা লক্ষ করে এগুচ্ছে। একটু পরে ঝড়ের সঙ্গে ছুঁচোলো বৃষ্টি। গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। কেঁদে দুঃখ জানানোর সময় নেই। আহা বলে হাত ধরবার সাথী নেই। কোথায় যাচ্ছে জানে না। তবু শ্যামা হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। পড়ে থাকলে মাঠের মাঝখানে ভূতে তুলে নিয়ে যাবে। সামনের মানুষগুলোকে অনুসরণ করে করে সে কাদের একটা বৈঠকখানায় এসে উঠল। গাদাগাদি ভিড়। পরস্পর ঠেলাঠেলি। সকলে ভিতরে ঢুকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে চাইছে। অতো জায়গা কোথায়। কেউ কেউ খড়ের গাদার মধ্যে মাথা গলিয়ে মাথা বাঁচাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক তোড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর বৃষ্টির প্রকোপ কমে এল। দুর্যোগে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা একে একে চলে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় শ্যামা কিছুই ঠিক করতে পারছে না। সে কোথায় উঠেছে? কোন দিকে যেতে হবে?